# ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৩. বিভ্রান্তির তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

## ৩. ৯. ২. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতি

ইসলাম সর্বকালের ও সর্বযুগগের সমগ্র মানব জাতির জন্য স্থায়ী জীবন ব্যবস্থা এবং বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন ধর্ম। কুরআন কারীম, হাদীসে রাসূল (ﷺ) ও সাহাবীগণের জীবনপদ্ধতি থেকে আমরা দেখতে পাই যে, এতে দু’টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে: একদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে যেন যুগ, সমাজ, সামাজিক রুচি ও আচার আচরণের পরিবর্তনের ফলে ইসলামের ধর্মীয় রূপে পরিবর্তন না আসে। অপর দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, যুগ, সমাজ, আচার-আচরণ ইত্যাদির পরিবর্তনের কারণে ইসলামের আহকাম পালনে যেন কারো কোনো অসুবিধা না হয়। সকল যুগের সকল দেশের মানুষেরা যেন সহজেই জীবন ধর্ম ইসলাম পালন করতে পারে।

এ মূলনীতির ভিত্তিতে ইসলামে মানব জীবনের কর্মকান্ডকে মূল দুভাগে ভাগ করা হয়েছে: (১) ইবাদাত ও (২) মুআমালাত। মানুষকে জীবন ধারণ করতে জাগতিক ও জৈবিক প্রয়োজনে যা করতে হয় এবং বিশ্বাসী-অবিশ্বাস ও ধার্মিক-অধার্মিক সকলেই যা করেন তা মুআমালাত বা জাগতিক কর্ম বলে গণ্য। আর জাগতিক প্রয়োজনের ঊর্দ্ধে শুধু মহান স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্য মানুষ যে কর্ম করে তা ইবাদত বলে গণ্য।
ইবাদত ও মুআমালাতের পার্থক্য বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার লেখা ‘‘এহইয়াউস সুনান’’ গ্রন্থটি পাঠ করতে পাঠককে অনুরোধ করছি। এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, ইবাদতের ক্ষেত্রে ইসলামে বিস্তারিত ও খুটিনাটি নিয়ম-পদ্ধতি ও বিধিবিধান প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে কর্ম যেভাবে করেছেন অবিকল সেভাবে করার বিশেষ তাকিদ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে মুআমালাত বা জাগতিক কর্মের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রশস্ততা দেওয়া হয়েছে। কিছু মূলনীতি প্রদান করা হয়েছে এবং ফরয ও হারাম নির্ধারণ করা হয়েছে। এর বাইরে সবই বৈধ বলে গণ্য হবে। মুআমালাতের ক্ষেত্রে কোনো বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তা বৈধ বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যা করেননি তা করা নিষিদ্ধ। আর মুআমালাতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যা নিষেধ করেছেন শুধু তাই নিষিদ্ধ, যা তিনি নিষেধ করেননি তা বৈধ।

চাষাবাদ, চিকিৎসা, বাড়িঘর তৈরি ইত্যাদি জাগতিক বিষয়ে যেমন প্রশস্ততা প্রদান করা হয়েছে, তেমনি প্রশস্ততা প্রদান করা হয়েছে ইবাদত পালনের জাগতিক উপকরণের ক্ষেত্রে। যেমন ইলম শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তবে শিক্ষার পদ্ধতি, উপকরণ ইত্যাদির বিষয় উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। কেউ বলতে পারেন না যে, সাহাবীগণের যুগে ছাপানো বই ছিল না, পরীক্ষা পদ্ধতি ছিল না বা সনদ প্রদানের পদ্ধতি ছিল না কাজেই তা নিষিদ্ধ। বরং যতক্ষণ না শরীয়তে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যাবে ততক্ষণ তা বৈধ।

বিবাহ, পরিবারগঠন, আবাসন, চিকিৎসা ইত্যাদির মত রাষ্ট্রগঠন, রাষ্ট্রপরিচালনা ও এ বিষয়ক দায়িত্বাবলি ‘‘মুআমালাত’’। এজন্য ইসলামে এ বিষয়ে মৌলিক নীতিমালার মধ্যে প্রশস্ততা প্রদান করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয়

অবকাঠামোর খুটিনাটি বিষয়ে দেশ, যুগ, জাতি ও পরিবেশের আলোকে ভিন্নতার অবকাশ রাখা হয়েছে। এ সকল মূলনীতির আলোকে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতি আলোচনার জন্য পৃথক গ্রন্থের প্রয়োজন। এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্র ‘‘থিওক্র্যাটিক’’ বা পুরোহিত-তান্ত্রিক নয়, বরং জনগণতান্ত্রিক। এখানে মোল্লা, পুরোহিত, ইমাম বা অন্য কোনো ধর্মীয় নেতাকে ‘‘আল্লাহর নামে’’ বা ‘‘আল্লাহর খলীফা’’ হয়ে শাসন করার ক্ষমতা বা সুযোগ দেওয়া হয় নি। ইসলামে কখনোই শাসককে ‘‘আল্লাহর খলীফা’’ হিসেবে গণ্য করা হয় নি, তাকে বিশেষ অধিকার, ক্ষমতা বা অভ্রান্ততা প্রদান করা হয় নি বা তাকে জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে রাখা হয় নি। বরং শাসককে জনগণের প্রতিনিধি ও জনগণের কাছে জবাবাদিহী বলে গণ্য করা হয়েছে।

কেবলমাত্র ‘শীয়া’ সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসে ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে রাজতান্ত্রিক ও পুরোহিততান্ত্রিক বলে দাবি করা হয়েছে। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, ইসলামের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব বা রাষ্ট্রক্ষমতা আলী (রা)-এর বংশধরদের পাওনা। আর ‘‘রাষ্ট্রীয় নেতা’’ বা ইমাম আল্লাহর খলীফা হিসেবে বিশেষ জ্ঞান, ক্ষমতা ও অধিকার সংরক্ষণ করেন। রাষ্ট্রীয় বিষয়ে তাঁর মতামতই চূড়ান্ত। তাঁর অনুপস্থিতি বা অদৃশ্য থাকা অবস্থায় ‘‘ফকীহ’’ তাঁর প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনার আলোকে সাহাবীগণ ও পরবর্তী মূলধারার মুসলিম আলিমগণ এ মত প্রত্যাখ্যান করেছেন। বস্ত্তত রাসুলুল্লাহ (ﷺ)এর আগমনের সময়ে পৃথিবীতে বিদ্যমান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মূল তিনটি বিষয় দেখা যায়:

প্রথমত: রাষ্ট্রক্ষমতার উৎস বংশ বা জবরদখল
রাজবংশের কেউ রাজা হবে এটাই ছিল সর্বজনস্বীকৃত রীতি। রাজতন্ত্রের বাইরে ক্ষমতা গ্রহণের একমাত্র উৎস ছিল অস্ত্র বা জবরদখল। রাজাকে হত্যা করে বা অস্ত্রের ক্ষমতায় রাজদন্ড গ্রহণ করা।

দ্বিতীয়ত: রাষ্ট্রের মালিকানা বা সার্বভৌমত্ব রাজার রাজ্যের সকল সম্পদ ও নাগরিক রাজার মালিকানাধীন। তিনি সকল জবাবাদিহিতার ঊধ্বে। রাষ্ট্রের সম্পদ ও নাগরিকদের বিষয়ে তিনি ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখেন এবং তার সিদ্ধান্ত প্রশ্নাতীত।
এরূপ সর্বোচ্চ ক্ষমতা বুঝাতে ইংরেজিতে (sovereignty) শব্দটি ব্যবহার করা হয়। শব্দটি প্রাচীন ফরাসী souverein, ল্যাটিন superanus/ super শব্দ থেকে এসেছে। এর মূল অর্থ (above) বা ঊধ্বে। যেহেতু রাজার ক্ষমতা সকলের ঊর্ধ্বে সেহেতু রাজাকে ইংরেজিত বলা হয় sovereign । ইংরেজীতে sovereign অর্থই king বা রাজা। আরবী অভিধানেও sovereign অর্থ ملك (রাজা)। (sovereignty) অর্থ বাংলায় রাজত্ব এবং আরবীতে মুলক (الملك) বা সিয়াদাত (السيادة) অর্থাৎ রাজত্ব বা কর্তৃত্ব।
বাংলায় এর প্রতিশব্দ হিসেবে ‘‘সার্বভৌমত্ব’’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। বাংলা এ শব্দটি ‘‘সর্বভূমি’’ থেকে গৃহীত। এর অর্থ ‘বিশ্বজনীন’ বা universal হওয়া উচিত। ইংরেজি (sovereign) বা সর্বোচ্চ শব্দের মূল অর্থের সাথে বাংলা সর্বভূম বা বিশ্বজনিন শব্দের মূল অর্থের মিল নেই। তবে প্রাচীন যুগে ‘‘সারা বিশ্বে পরিচিত’’ অর্থে শাসক বা বড় পন্ডিতকে ‘‘সার্বভৌম’’ উপাধি দেওয়া হতো। এভাবে রাজাকে ‘‘সার্বভৌম’’ বলার প্রচলন ঘটে। আর এথেকেই রাজত্বকে সার্বভৌমত্ব বলা হয়।

তৃতীয়ত: রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বা প্রতিভূ
প্রায় সকল সমাজেই রাজাকে কোনো না কোনোভাবে ঈশ্বরের পুত্র, প্রতিনিধি বা বংশধর বলে কল্পনা করে তাকে ঐশ্বরিক বা ধর্মীয় পবিত্রতা, অধিকার ও অভ্রান্ততা (infalliblity) প্রদান করা হয়েছে। বিশেষত খৃস্টীয় চতুর্থ শতকের শুরুতে বাইযান্টাইন- রোমান সাম্রাজ্যে খৃস্টধর্মকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা প্রদানের পর থেকে ইউরোপে থিওক্র্যাটিক শাসনের শুরু হয় এবং ধর্মের নামে বা আল্লাহর নামে শাসক ও পুরোহিতদেরকে আল্লাহর প্রতিনিধি ও প্রতিভু হিসেবে বিশেষ পবিত্রতা প্রদান করা হয়। তাদের নির্দেশ আক্ষরিক পালন করা ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা হয় এবং তাদের নির্দেশ অমান্য করা ধর্মদ্রোহিতা বলে গণ্য হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রাষ্ট্রের বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মূলনীতি প্রদান করেন। তাঁর দেওয়া মূলনীতির প্রধান দিকগুলি নিম্নরূপ:

প্রথমত: রাষ্ট্রক্ষমতার উৎস নাগরিকদের পরার্মশ
কুরআন কারীমে এবং হাদীস শরীফে মুমিন জীবনের সকল ক্ষেত্রে সংশিষ্ট সকলের পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ মূলনীতি হাতে-কলমে শেখানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কাউকে তাঁর পরে রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য মানোনয়ন দেওয়া থেকে বিরত থাকেন, যেন মুসলিমগণ পরামর্শ ব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োগ করতে পারেন।
মহান আল্লাহ মুমিনদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

‘‘যারা তাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দিয়েছে, সালাত কায়েম করেছে, তাদের কর্ম তাদের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শভিত্তিক এবং তাদেরকে যা রিযকপ্রদান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।’’[1]
তাহলে, মুমিনদের সকল কর্ম তাদের সকলের পরামর্শভিত্তিক। যে বিষয়ে আল্লাহর সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা নেই এরূপ সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশিষ্ট সকলের পরামর্শ গ্রহণই মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্য। আর এরূপ বিষয়ের অন্যতম রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি, যা সকল নাগরিকের স্বার্থের সাথে সংশিষ্ট। শাসক, প্রশাসক, সরকার বা জনপ্রতিনিধি নির্বাচন, নির্বাচনের মেয়াদ, সরকার পরিচালনা পদ্ধতি, এ বিষয়ক নীতি নির্ধারণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা যে সংশিষ্ট সকলেই পরামর্শ প্রদান করবেন। নারী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাধারণ-অসাধারণ সকলের পরামর্শ গ্রহণ এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। কাউকে বাদ দেওয়ার কোনোরূপ নির্দেশনা নেই। যদি কেউ পরামর্শ দেন ও অন্যরা মেনে নেন তাহলেও অসুবিধা নেই।

কুরআন-হাদীসে সংশিষ্ট সকলের পরামর্শ গ্রহণের তাকিদ দেওয়া হয়েছে, তবে পরামর্শ গ্রহণের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেওয়া হয় নি। বরং অন্যান্য জাগতিক ও উপকরণ সংশিষ্ট বিষয়াদির মত এ বিষয়কে যুগ, জাতি ও পরিবেশের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। সংশিষ্ট মানুষদের অবস্থা অনুসারে সরাসারি সকল নাগরিকের, তাদের প্রতিনিধিদের, গোত্রপতিদের, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের বা সামাজিক নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে। এরূপ পরামর্শ গ্রহণ মুখে হতে পারে বা গোপন ব্যালটে হতে পারে। এক্ষেত্রে পরামর্শ গ্রহণের কোনো একটি পদ্ধতিকে ইসলামী বা ইসলাম বিরোধী বলে গণ্য করার কোনো সুযোগ নেই।
সাহাবীগণের যুগে বা পরবর্তী যুগে ছিল না বলে বা প্রাচীন ফিকহের গ্রন্থে লেখা নেই বলে সার্বজনীন ভোট ব্যবস্থা,

৪ বা ৫ বৎসর পরে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা বা পরামর্শ গ্রহণের অনুরূপ কোনো পদ্ধতিকে ইসলাম বিরোধী বলে চিন্তা করা আর মাদ্রাসায় পরীক্ষা ব্যবস্থা, সনদ প্রদানের ব্যবস্থা, ছাপানো বই পড়ার ব্যবস্থা বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার ইসলাম বিরোধী বা নিষিদ্ধ বলে চিন্তা করা একই ধরনের অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তি।

দ্বিতীয়ত: রাষ্ট্রের মালিকান জনগণের

মালিকানা দু প্রকারের। সকল কিছুর প্রকৃত মালিকানা মহান আল্লাহর। তিনিই মালিক, রাজা বা sovereign । পাশাপাশি জাগতিকভাবে মানুষকে দুনিয়াতে তার সম্পদের মালিকানা প্রদান করা হয়েছে এবং মালিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এভাবে রাষ্ট্রের মালিকানা জনগণের।

আমরা দেখেছি যে, প্রাচীন ব্যবস্থায় রাজা ছিলেন sovereign বা সার্বভৌম। রাজ্যের সকল সম্পদ ও নাগরিকের সর্বোচ্চ বা প্রশ্নাতীত মালিকানা (sovereignty) ছিল তার একার। তিনি নিজের প্রয়োজন, সুবিধা ও ইচ্ছামত তা ব্যবহার করবেন, এতে কারো কোনো আপত্তি বা প্রশ্ন করার অধিকার ছিল না। পক্ষান্তরে ইসলামে রাষ্ট্রের মালিকান নাগরিকগণের। নিজের মালিকানাধীন জমিন যেমন মুমিন আল্লাহর নির্দেশের আওতায় নিজের প্রয়োজন, সুবিধা ও ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারেন, তেমনি রাষ্ট্রের জনগণ রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা ও সম্পদ আল্লাহর নির্দেশের আওতায় থেকে নিজেদের প্রয়োজন ও সুবিধা অনুসারে ব্যবহার করবেন।

নিজের মালিকানাধীন সম্পদ, অর্থ ও অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় রাষ্ট্রের বিষয়াবলিও আল্লাহর নির্দেশ মত পরিচালনা করার বিষয়ে জনগণ দায়বদ্ধ। এ দায় পালনের জন্য শাসক তাদের প্রতিনিধি এবং তাদের কাছে জবাবদিহী। শাসক রাষ্ট্রের মালিক নন, বরং জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালন করেন। তিনি জনগণের কাছে জবাবাদিহী। জনগণ তাকে যে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারে, শাসন ও সংশোধন করতে পারে। এজন্যই শাসক বা সরকার নির্বাচনে জনগণের পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশনা। জনগণের মধ্য থেকে তাদের পরামর্শে সরকার নির্বাচিত হবেন। আর তাদের কর্মকান্ডের জন্য তারা জনগণের কাছে জবাবদিহী থাকবেন।

তৃতীয়ত: শাসকের কোনো অভ্রান্ততা বা পবিত্রতা নেই

ইসলামের দৃষ্টিতে শাসক কখনোই আল্লাহর খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত (successor/vicar) নন। অন্য সকল মানুষের মতই তিনি আল্লাহর বিধান ও ব্যবস্থার অধীন। মহান আল্লাহ রাষ্ট্র পরিচালনা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য যে মূলনীতি প্রদান করেছেন তা পালন করতে তিনি বাধ্য। রাষ্ট্রপরিচালনা বিষয়ে ইসলাম কিছু মূলনীতি দিয়েছে, যেগুলির মধ্যে রয়েছে জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলের মৌলিক নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা, জীবন, জীবিকা, ধর্ম, বাসস্থান ও পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, জনগণের পরামর্শ গ্রহণ করা, বৈষম্যহীন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, অপরাধীর সঠিক শাস্তি নিশ্চিত করা ইত্যাদি। বিচার ও শাস্তির ক্ষেত্রে ইসলামে কিছু শাস্তি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, যেগুলি সমাজের অপরাধ দমন করে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করে। অন্যান্য অপরাধে শাসক, সরকার বা প্রশাসন প্রয়োজনীয় যুগোপযোগী শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। এ সকল মূলনীতি ও বিধিবিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং ইসলামের নির্দেশনার ব্যাখ্যা প্রদানে শাসকের নিজস্ব কোনো পবিত্রতা বা অভ্রান্ততা নেই। জনগণের শাসনে, নির্দেশ দানে বা আল্লাহর বিধানের ব্যাখ্যায় তাঁর নিজের মতের কোনো বিশেষ মূল্য নেই। তার ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত ভুল বলে মনে হলে যে কেউ তার সমালোচনা এবং ভুল সংশোধন করতে পারেন।

অন্যান্য মুআমালাতের ন্যায় রাষ্ট্রনীতি ও আইন-বিচারের ক্ষেত্রে ইসলামে মূলনীতি দেওয়া হয়েছে এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে প্রশস্ততা প্রদান করা হয়েছে। কয়েকটি অপরাধের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু শাস্তি প্রদানের প্রক্রিয়া কঠিন করা হয়েছে। নীতি, বিধান ইত্যাদির ব্যাখ্যা ও প্রয়োগে কারো অভ্রান্ততা দেওয়া হয় নি। এজন্য মুসলিম দেশগুলিতে কখনোই ইউরোপের মত স্বৈরাচার বা থিওক্র্যাসি প্রতিষ্ঠিত হয় নি।
ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় আলিমগণ কখনো ধর্মের নামে ক্ষমতা গ্রহণ করেননি। আলিমগণ কুরআন-হাদীসের নীতিমালা ব্যাখ্যা করেছেন আর শাসকগণ প্রয়োগ করেছেন। উভয় বিভাগেরই স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা ছিল। ব্যাখ্যায় ভুল হয়েছে বলে মনে হলে শাসকগণ তা প্রত্যাখ্যান করেছেন ও সকল আলিমের পরামর্শ নিয়েছেন। প্রয়োগে ও বাস্তবায়নে ভুল হয়েছে মনে করলে জনগণ ও আলিমগণ প্রতিবাদ করেছেন। সকল স্বৈরাচারের মধ্যেও শাসকের সমালোচনা, কম বেশি বাকস্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, গবেষনা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত ছিল। কখনোই কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে ধর্মের নামে ভিন্নমতাবলম্বী বা ভিন্নধর্মীয়দের উপর নিয়মতান্ত্রিক বা রাষ্ট্রীয় নির্যাতন করা হয় নি। খৃস্টীয় অষ্টম শতক থেকে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত ইউরোপ, ভারত, মধ্যপ্রাচ্য ও বিশ্বের যে কোনো অমুসলিম দেশের সাথে সে যুগের মুসলিম দেশগুলির অবস্থা তুলনা করলে যে কোনো গবেষক নিশ্চিত হবেন যে, মুসলিম দেশগুলিতে সকল ধর্মের মানুষ সর্বোচ্চ নাগরিক অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করেছেন।

## ফুটনোট

[1] সূরা (৪২) শূরা: আয়াত ৩৮।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6925

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন